OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 71 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 71 - 82
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

কৃষ্ণরাম দাসের মঙ্গলকাব্যে সমকালীন সমাজ-বাস্তবতা ও ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয়

উমা বেরা
গবেষক, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : mail2umabera@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Social Reality, Religious Culture, Communal Harmony.

Abstract

The primary history of Mangal Kavya dates back nearly five hundred years. Following the Turkish invasions, a new literary tradition known as Mangal Kavya emerged in Bengali literature, centered around mythological and folk deities. This literary genre synthesized religious elements from Buddhism, Jainism, Hinduism, Islam, and Vaishnavism. Although the early Mangal Kavya of the medieval period predominantly featured supernatural themes, they also reflected contemporary social structures and hinted at the integration of religious cultures within socio-economic, political, historical, and religious contexts. During the Mughal rule in the medieval period, gradual transformations took place in the social system. These changes over time influenced the style and composition of Mangal Kavya. Alongside supernatural themes, the depiction of folk life became particularly prominent in the Mangal Kavya composed during the later medieval period.

Poet Krishnaram Das, active in the latter half of the 17th century, was the first to compose five separate Mangal Kavya dedicated to five different deities. His works reflect both the traditional structure of Mangal Kavya and the introduction of new stylistic elements. During the reign of Mughal Emperor Aurangzeb, he composed five Mangal Kavya: Kalika Mangal, Ray Mangal, Shashti Mangal, Shitala Mangal, and Kamala Mangal. Krishnaram Das's writings exhibit not only devotional sentiments but also a strong pragmatic outlook. Alongside devotion, his works vividly portray contemporary social realities, folk traditions, and the synthesis of religious cultures. His literary style prominently features Vaishnavism, while also reflecting the long-standing coexistence of Hindus and Muslims. This cohabitation led to a unique socio-religious and cultural integration, which finds expression in his poetry. In this article, I have attempted to provide a comprehensive discussion on these aspects of his work.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 71 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

তুর্কি আক্রমণের প্রায় তিনশত বছর পর থেকে বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক এবং লৌকিক দেবতাদের নিয়ে রচিত মঙ্গলকাব্য নামে নূতন সাহিত্য ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। এই সাহিত্য ধারা বাংলা সাহিত্যে প্রায় পাঁচশত বছর ধরে বহমান ছিল। এরই পাশাপাশি বৈষ্ণব সাহিত্য, চরিত সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, ইসলামী সাহিত্য, পীর সাহিত্য প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে নূতন সাহিত্য ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। মধ্যযুগে রচিত এই সাহিত্যধারাগুলির মধ্যে প্রথম পর্যায় অলৌকিক ভাবধারা বেশি মাত্রায় থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন সমাজ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি, রাজনৈতিক অবস্থা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, লোকাচার, অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্মীয় পটভূমি সাহিত্যধারাগুলির মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে এবং রচনারীতির পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় সমন্বয়ের আভাস স্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়।

পৌরাণিক এবং লৌকিক ভাবধারা থেকে সৃষ্ট মিশ্রসত্ত্ব দেবতাদের নিয়ে রচিত কাব্য মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। বাইরে থেকে দেখতে গেলে মঙ্গলকাব্যগুলি সাধারণত বিশেষ কোনো হিন্দু দেবতা বা দেবীকে ঘিরেই আলোচনা হয়ে থাকে। এই সকল দেবভাবনার মধ্যে ছিল মূলত বাংলার নিজস্ব মাটির লৌকিক স্তর থেকে উঠে আসা স্থানীয় ভাবনা। এরই পাশাপাশি লৌকিক জনজীবনের লোকাচার, রীতিনীতি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যের দেবতাগণ আঞ্চলিক হিন্দুত্ববাদ ও বাংলার ইসলাম ধর্মের জনজীবনের বাস্তব প্রতীকী রূপ।

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাদেরকে অসাধারণ, দৃঢ় মানবিক গুনাবলীর অধিকারী হতে দেখা যেত। মঙ্গলকাব্যে স্থানীয় ও লৌকিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রায় ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে সংঘাত ঘটে থাকে, শেষপর্যন্ত ভক্তের মনে দেবতাগণ ভক্তিভাব জাগাতে সক্ষম হন এবং ওই অঞ্চলে নিজেদের স্থায়ীভাব প্রচার করে পূজা গ্রহণ করেন। ভক্ত এবং ভগবানের সংঘাত মধ্যযুগে রচিত প্রায় সমস্ত মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই দেখা যায়। মর্ত্যলোকে পূজা প্রচারের উদ্দেশে দেবী মনসা, দেবী শীতলা, দেবী চন্ডী প্রমুখ দেবদেবীগণ নানান বিপর্যয় সৃষ্টি করে ভক্তিহীন ভক্তের মনে জাগিয়ে তুলেছেন ভক্তিভাব, নিয়েছেন পূজা পাওয়ার অধিকার। *মনসামঙ্গল* কাব্যে জালু-মালু, হাসান-হোসেনের হাত থেকে যেমন মা-মনসা পূজা নিয়েছেন, তেমনই চাঁদ সদাগরের হাত থেকেও পূজা নিয়েছেন। একইভাবে *শীতলামঙ্গল* কাব্যে মা-শীতলা মদনদাস জগাতি, কাজী সাহেব প্রমুখের হাত থেকে পূজা নিয়েছেন। *ষষ্ঠীমঙ্গলকাব্যে* মা ষষ্ঠী ভক্তিহীন বেনে বৌ-এর মনে ভক্তিভাব জাগিয়েছেন তার সদ্যোজাত সন্তান অপহরণের মাধ্যমে। *কালিকামঙ্গল* কাব্যে উল্লিখিত কাঞ্চি দেশের রাজপুত্র সুন্দর মা-কালীর প্রতি সাধকভাবে ভক্তিভাব প্রকাশ করেছে। মধ্যযুগে রচিত প্রায় সমস্ত মঙ্গলকাব্যেই দেবদেবীগণ এইভাবে পূজা প্রচার করিয়ে সমাজে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মঙ্গলকাব্যের ধারার মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম প্রভৃতি ধর্মীয় ভাবধারাগুলি এসে মিলিত হয়েছে। সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যায়ে কবি কৃষ্ণরাম দাস পাঁচজন আলাদা দেবতাদের নিয়ে পাঁচটি মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন। এই কাব্যগুলি রচনার মাধ্যমে তিনি সমকালীন সমাজবাস্তবতা, লোকাচার, ধর্ম-সংস্কৃতি সমন্বয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনই হিন্দু মুসলিম ধর্মের সমন্বয়ের অবস্থাকে তুলে ধরেছেন। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে কবি একদিকে যেমন জনজীবনে ভক্তিভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তেমনই রোমান্টিক প্রেমের বর্ণনা করেছেন।

রায়মঙ্গল কাব্যে কাঠুরিয়া রতাই ভক্তিভাবে পূজা করে দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য স্মরণ করেছেন-

"ভকতবৎসল রায় গুণের সাগর।
বাউল্যার পূজা লইয়া বড় কুতুহল।।
অভিমত বর দিয়া করিলেন গতি।
অন্তর্ধান হইল দেব দক্ষিনের পতি।।"[১]

পুষ্প দত্তের মাতা রানী সুশীলা দক্ষিণরায়ের ভক্তিভরে সেবা করেন পুত্রের বাণিজ্য যাত্রার মঙ্গল কামনায়-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 71 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"তথায় সুশীলা রামা পরম বিকল
রাখিতে না পারে দুটি নয়ানের জল।।
পাটনে হইবেক শুনি পুত্রের গমন।
পূজিয়া দক্ষিণরায় করেন স্তবন।।
তোমা বিনা গতি নাহি বলি করপুটে।
উদ্ধার করিয়া লবে বিষম শঙ্কটে।।"[২]

রায়মণির কাছে মাতা সুশীলা যেমন পুত্রের মঙ্গল কামনা করেছেন, তেমনই পুত্রকেও বিপদে রায়মণির স্মরণ নিতে বলেছেন। *ষষ্ঠীমঙ্গল* কাব্যে মা-ষষ্ঠী সখী লীলাবতীর রূপ ধরে সপ্তগ্রামের অধিপতি সত্রজিতের অন্তঃপুরে রানীর নিকটে গিয়ে মা-ষষ্ঠীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে ভক্তিভাব জাগিয়েছিলেন সনকপুরের সায়বেনের পত্নীর ভক্তিভাব বর্ণনার মাধ্যমে-

"ষষ্ঠীর দিবসে সতী যতন করিএ অতি
উপহার আনিল সকল।
ভকতি কি কবো আর যেমন শকতি তার
যাইতে দেবীর কুতূহল।।"[৩]

একইভাবে *কমলামঙ্গল, শীতলামঙ্গল* কাব্যেও জনজীবনে ভক্তিভাবের প্রতিচ্ছবি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

প্রেমভক্তি বর্ণনার পাশাপাশি কবি কৃষ্ণরাম দাস জনজীবনের রোমান্টিক প্রেমের বাস্তব প্রতিচ্ছবি বর্ণনা করেছেন। যা বর্তমান সমাজেও বহমান আছে। কালিকামঙ্গল কাব্যে কবি রোমান্টিক প্রেমের বর্ণনা করেছেন বিদ্যাসুন্দরের প্রেম কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে। কাঞ্চি দেশের রাজপুত্র ভক্ত বৎসল সুন্দর সাধকভাবে কালীর সাধনা করতেন। তিনি স্বপ্নে বর্ধমানের রাজা বীর সিংহের কন্যা বিদ্যার রূপমাধুর্যে মোহিত হয়েছিলেন। কবির বর্ণনায় মা-কালীর কৃপায় বিদ্যাসুন্দরের মিলন ঘটেছে। কবি কৃষ্ণরাম দাস বিদ্যাসুন্দরের প্রেম কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে কাব্যের আরম্ভেই রাধা কৃষ্ণের স্মরণ করেছেন।

"রাধার সহিত কৃষ্ণ বন্দিব প্রথমে।
মৎস্য আদি অবতার বন্দি ক্রমে ক্রমে।।"[৪]

কবি এভাবেই নিখুঁত বর্ণনার মাধ্যমে মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রেম ভক্তির পাশাপাশি রোম্যান্টিক প্রেমের বাস্তব প্রতিরূপ তুলে ধরেছেন।

মধ্যযুগের প্রথম পর্যায় রচিত *মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল* প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের রচনারীতির থেকে কবি কৃষ্ণরাম দাসের মঙ্গলকাব্যগুলির রচনারীতি অনেকখানি আলাদা। কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে না পারলেও তাঁর রচনায় ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অলৌকিকতার প্রভাবের চাপ কমে গিয়ে লোকায়ত ভাবধারা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। একইসঙ্গে সমকালীন সমাজ-বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি এবং ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে।

দিল্লির সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে বাংলাদেশে শায়েস্তা খাঁর শাসনকাল মোঘল যুগের ইতিহাসে সুশাসন নামে অভিহিত ছিল, যার ইঙ্গিত কবি *রায়মঙ্গল, কালিকামঙ্গল* প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের রচনাশৈলীতে তুলে ধরেছেন। তাছাড়া তৎকালীন সময় জমিদারী ব্যবস্থার প্রচলন ছিল; জমিদাররা যেমন অত্যাচারী ছিলেন তেমন অনেক জমিদার সুশাসকও ছিলেন। তাদের শাসনে শৃঙ্খলতা থাকার ফলে গ্রামে শান্তি বজায় থাকত। কবি কৃষ্ণরাম দাস এমনই এক জমিদারের কথা তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন। তিনি হলেন সপ্তগ্রামের অধিপতি সাবর্ণ রায়চৌধুরী, নিমিতা গ্রামে যাঁর আদিবাস ভূমি ছিল।

কবি কৃষ্ণরাম দাসের রচিত পাঁচটি গ্রন্থের মধ্যে চারটি দেবতা বিষয়ক এবং একটি প্রণয়কাহিনী মূলক। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আর কোনো কবি এতজন দেবতা নিয়ে একত্রে এতগুলি মঙ্গলকাব্য রচনা করেননি। এই বৈচিত্র্যই কবি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 71 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কৃষ্ণরাম দাসের রচনার প্রধান এবং প্রথম বৈশিষ্ট্য। এই বৈচিত্র্য থেকে কবি কৃষ্ণরাম দাসের ধর্ম বিশ্বাসের একটি বিশেষ দিকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি তাঁর বর্ণিত কোনো দেবদেবীরই ভক্ত ছিলেন না। তিনি ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি সমন্বয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি তাঁর রচনায় যেখানে বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে কথা বলেছেন সেখানেই তাঁর উচ্ছ্বসিত ভাব প্রকাশ করেছেন। কালিকামঙ্গল কাব্যের দিক বর্ণনা অংশে-

"যথায় কীর্তন হয় চৈতন্যচরিত্র।
বৈকুণ্ঠ সমান ধাম পরম পবিত্র।।
তাহে গড়াগড়ি দেয় যেবা প্রেমে নৃত্য করে।
জীবনমুকুত তার ধন্য দেহ ধরে।।
হেলায় শ্রদ্ধায় জীব কণ্ঠী ধরে যত।
তাহা সবাকারে মোর প্রণাম শত শত ।।
শ্রীকৃষ্ণগুণ শ্রবণে পুলক যার হয়।
তাহারে[১] পুণ্যবান বলি বেদ মিথ্যা নয়।।"[৫]

শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল কাব্যে কবি পুষ্প দত্ত, ঋষিকেশ সাধুর সমুদ্রযাত্রাবর্ণনায় সেতু বন্ধ অংশে *রামায়ণ* বর্ণনার মাধ্যমে বৈষ্ণবীয় ভাবধারা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। একইভাবে কবি কৃষ্ণরাম দাস *রায়মঙ্গল, কমলামঙ্গল* কাব্যের পরতে পরতে উচ্ছ্বসিত ভাবে বৈষ্ণব ধর্মের বর্ণনা করেছেন।

বৈষ্ণবধর্ম বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ প্রভাব ফেলেছে পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যায় থেকে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। এইসময়ের মধ্যে লৌকিক মঙ্গলকাব্য বলতে শুধু *মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল* রচিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে কিন্তু সাহিত্য ধারার পরিবর্তন ঘটেছে। মঙ্গলকাব্যের বিবর্তন ধারার মূল কারণ হল যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিভাব ও ধর্ম বিশ্বাসের ক্রমন্বয়ে অবনতি। সমাজজীবনের কালানুক্রমিক বিবর্তনের ধারাতে এই লক্ষণ সুস্পষ্ট। বিস্ময় ও একান্ত দৈব নির্ভরতার প্রভাব কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিপ্রবণ মনের বিকাশ ঘটতে থাকে। ষোড়শ শতকের চন্ডীমঙ্গলের শিব-দূর্গা, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের শিব-দূর্গার পার্থক্যই এর মূল প্রমাণ। ভক্তি ক্রমে ব্যঙ্গের স্তরে নেমে গেছে, দৈববিশ্বাস ক্রমে অবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। সপ্তদশ শতকের ধর্মবিশ্বাসে যে দোলাচল সৃষ্টি হয়েছিল, কবি কৃষ্ণরাম দাসের রচিত মঙ্গলকাব্য তারই প্রমাণ। পঞ্চদশ শতকের মঙ্গলকাব্য রচনার যে ধারা- মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, তা সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে শেষ হয়েছে।

সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ নূতন অনুশীলনের যুগ। তবে এই অনুশীলন পুরোপুরি নূতন ধারায় প্রভাবিত হয়নি। পুরাতন জীর্ণ অট্টালিকা সংস্কার সাধন করে যেমন নূতন নূতন ছোট্ট ছোট্ট গৃহে রূপান্তরিত হয়েছে তেমনই এ যুগে সাহিত্যে দুটি প্রধান লক্ষণ দেখা গিয়েছে -

ক. পুরাতন লৌকিক মঙ্গলকাব্যের ছাঁচে নূতন নূতন দেবদেবী নিয়ে কাব্যের সৃষ্টি।
খ. ভক্ত মনোভাবের বিলোপ ঘটেছে ধীরে ধীরে।

কবি কৃষ্ণরাম দাস একাই একাধিক দেবদেবী নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন, এর মাধ্যমে তিনি যে বিশেষ কোনো দেবতার ভক্ত ছিলেন না, তারই প্রকাশ ঘটেছে। এছাড়া লৌকিক ধর্ম সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম নিরপেক্ষ লৌকিক প্রণয়কাব্য তিনি সৃষ্টি করেছেন।

কবি কৃষ্ণরাম দাস একাধিক দেবদেবীদের নিয়ে কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে ভক্ত মনোভাব অপেক্ষা বৈষয়িক মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অষ্টদশ শতাব্দীর কবিদের মত দেবতার প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতে না পারলেও, এই পথের ইঙ্গিত যে তিনি করে দিয়েছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাই প্রাচীন লৌকিক মঙ্গলকাব্যের ধারার সঙ্গে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 71 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্বাচীন মঙ্গলকাব্যের ধারায় কবি কৃষ্ণরাম দাসের প্রভাব দুই ভাবে পড়েছে। প্রথমত লৌকিক প্রণয়কাব্যকে তিনি শুদ্ধ সামাজিক স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। ধর্মের সঙ্গে লৌকিক প্রণয়কাব্যের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। প্রণয়কাহিনী লৌকিক মঙ্গলকাব্যের অঙ্গীভূত হয়ে কালীর মাহাত্ম্য সূচক পাঁচালী হিসাবে অষ্টদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। কবি কৃষ্ণরাম দাসের বিদ্যাসুন্দর কাহিনী যুগোপযোগী অভিনব সৃষ্টি। মঙ্গলকাব্যের ধারায় বিদ্যাসুন্দর কাহিনী এক বিচিত্র সংযোজন।

কবি কৃষ্ণরাম দাস কয়েকজন লৌকিক দেবদেবীকে সাহিত্যের আসনে মহিমাময় স্থান দিয়ে মঙ্গলকাব্যের ধারায় নূতনত্বের সৃষ্টি করেছেন। কবি *কালিকামঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, কমলামঙ্গল* কাব্যের আদি এবং অন্যতম রচয়িতা। কবি কৃষ্ণরাম দাসের কোনো রচনারই পূর্ববর্তী রচনা না পাওয়া গেলেও তাঁর উপর পূর্ববর্তী কবির প্রভাব পড়েনি এমনটা নয় বরং একজন কবির প্রভাব কবি কৃষ্ণরাম দাসের ওপর এত বেশি মাত্রায় পড়েছে যে সহজেই তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তিনি হলেন কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। কবি কৃষ্ণরাম দাস নানাভাবে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে অনুসরণ করেছেন, *কালিকামঙ্গল* কাব্যের বিমলা মালিনী *চন্ডীমঙ্গল* কাব্যের দুর্বলা দাসীর আদর্শে রচিত। মালিনীর চাটুর্য, সুন্দরকে ঠকানোর বিশেষ পদ্ধতি সবই *চন্ডীমঙ্গল* থেকে নিয়েছেন।

রায়মঙ্গল কাব্যটি পশুর দেবতা বিষয়ক। চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খন্ডের কালকেতু উপখ্যানের বনদেবী এখানে ব্যাঘ্র দেবতায় পরিণত হয়েছেন। এছাড়া রায়মঙ্গল কাব্যে পুষ্পদত্ত সাধু এবং শীতলামঙ্গল কাব্যের ঋষিকেশ সাধুর বাণিজ্য যাত্রা, চন্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্তের বাণিজ্য যাত্রার অনুকরণে বর্ণিত হয়েছে। বাণিজ্য যাত্রা পথের বর্ণনা প্রায় একই রূপ; পথের সমস্ত ঘটনা, মায়া দৃশ্য প্রভৃতি সব এক। সাধুগণের বিপদ এবং বিপদ থেকে উদ্ধারের বর্ণণায় কোনো বৈচিত্র্য নেই। চন্ডীমঙ্গলে সাধু অজয় নদ থেকে যাত্রা করে গঙ্গা দিয়ে সমুদ্রে পৌঁছে সিংহল গিয়েছিলেন, রায়মঙ্গলে বর-দহ থেকে সাধু যাত্রা করে গঙ্গা বেয়ে সমুদ্র পথে সিংহল, রাজদহ অতিক্রম করে দক্ষিণ পাটনে উপস্থিত হয়েছিলেন। শীতলামঙ্গলে সাধু আবার অজয় নদ থেকে যাত্রা করে রায়মঙ্গলের পথে সিংহল, রাজদহ, মায়াদহ অতিক্রম করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছেন। রায়মঙ্গলে উত্তরে যেটুকু পথ বাকি ছিল শীতলামঙ্গলে তা পূর্ণ হয়েছে; চন্ডীমঙ্গলের যাত্রাপথ যে কৃষ্ণরাম দাসের লক্ষ্য এর থেকেই তা প্রমাণিত হয়। কমলামঙ্গলে কমলা বৃদ্ধা বেশে বল্লভ সাধুকে রক্ষার জন্য এসেছেন, চন্ডীমঙ্গলে চন্ডীর জয়তী বেশে আগমনের ছায়া অবলম্বনে কবি কৃষ্ণরাম দাস তা রচনা করেছেন। এইভাবেই কবি কৃষ্ণরাম দাসের রচনার পরতে পরতে চন্ডীমঙ্গল কাব্যের ছাপ বর্ণিত হয়েছে।

লৌকিক সমাজে গল্প কাহিনীতে সাধারণত হিন্দু, মুসলমান, ভুস্বামীদের যুদ্ধ সংঘর্ষ তৎকালীন সমাজে ঘন ঘন ঘটে থাকত; সমাজের এই দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবি সমকালীন সময়ে রচিত সাহিত্যে ছাপ ফেলেছে। কবি কৃষ্ণরাম দাসের পূর্বে দক্ষিণরায়ের বর্ণিত পুঁথি পাওয়া যায় না; তবে *রায়মঙ্গল* কাব্যে মাধবাচার্য নামে আদি কবির নাম পাওয়া যায়, তাঁর রচিত কোনো সংক্ষিপ্ত পুথি পাওয়া যায়নি। তাই বলা যেতে পারে কবি কৃষ্ণরাম দাস রচিত *রায়মঙ্গল* কাব্যে গাজী সাহেব ও রায়মনির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সময়ের সমাজের হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্মের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি বর্ণনা করেছেন-

"অকালে প্রলয়ে পড়ে ঢাল খাঁড়ায় দুহে নড়ে
সাঁজোয়ার কোপ ঝনঝন।
ক্ষিতি করে টলমল হেন বুঝি যায় তল
বিকল সকল দেবগণ।।"[৬]

রায়মঙ্গল কাব্যে বড়ো গাজী খাঁর সঙ্গে দক্ষিণরায়ের বিরোধের কাহিনীটি প্রশংসার যোগ্য। উদ্ধত মুসলমানের ধর্মান্ধতাবশত হিন্দুর প্রতি অত্যাচার বর্ণনায় কবিকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। ব্যাঘ্রবাহন বড়ো গাজী খাঁ দক্ষিণরায়ের আস্তানা ভেঙে রায়ের সেবকদের মেরে ধরে থামেননি বরং অশ্রাব্য গালিগালাজ করেছেন, যা আসলে তৎকালীন সমাজ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 71 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জীবন থেকে উঠে আসা প্রতিচ্ছবির ইঙ্গিত দেয়।

মঙ্গলকাব্যে সমাজ বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। সপ্তদশ শতকের প্রথম থেকে অষ্টদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মোট একশত বছর ধরে বাংলার সামাজিক জীবন বিকাশের ইতিহাস হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পঞ্চদশ শতক থেকে ধর্মান্তকরণের ফলে বহু নিম্নবর্ণের হিন্দু ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। একদিকে রাষ্ট্রের দুর্নীতি, নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের অপ্রীতিকর ব্যবহার; আর একদিকে উদারতা, ইসলাম ধর্মের ভ্রাতৃত্বের আহ্বান, পীর-ফকিরদের আধ্যাত্মবোধ, কলাকৌশল ইত্যাদি নানা কারণে হিন্দু সমাজে একদিকে ধর্মান্তকরণের যে ধারা বেড়েছিল তা মোঘল যুগেও হ্রাস পায় নি। ধর্মান্তকরণের জোয়ারকে থামাতে ষোড়শ শতকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর পরিকরগণ যেভাবে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ঠিক সেই ভাবেই কয়েকজন কবি লৌকিক দেবদেবীদের নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচনা করে সামাজিক গোঁড়ামি এবং ধর্মীয় বিরোধ ভুলিয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন এবং সমগ্র জনসমাজকে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রেরণা দিয়েছেন। কায়স্ত কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তাঁর রচনা *রায়মঙ্গল* কাব্যে বড়ো খাঁ গাজী ও দক্ষিণরায়ের কাহিনী বর্ণনা এবং *শীতলামঙ্গল* কাব্যে কাজী পালায় কাজী সাহেব মা শীতলা ও তাঁর সেবক বসন্ত রায়ের কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে সমাজে সেই প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন।

ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয় কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যের একটি বড়ো গুণ, কবি যা তাঁর রচনারীতির পরতে পরতে তুলে ধরেছেন। কবি তাঁর গ্রন্থে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকধর্মকে নিয়েছেন। *শীতলামঙ্গল* কাব্যে কবি কৃষ্ণরাম দাস তিনটি কাহিনী নিয়েছেন। মদনদাস জগাতি পালা, কাজী পালা, ঋষিকেশ সাধুর পালা বর্ণনার মাধ্যমে সমাজে তৎকালীন সময় যে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় ঘটেছিল তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। কাজী পালায় কাজী হিন্দুর দেবতা মা- শীতলার কাছে ভর্ৎসিত হয়ে বলেছেন-

"কাজি বলে মহাশয় যে বলো সকল হয়
অমন অজ্ঞান বটে আমি।
নয়ান থাকিতে সন্দ না বুঝে বলিলেম মন্দ
কি লাগি আসিয়েছিলে তুমি।।
এখন বুঝিলেম ভাবি শীতলা পরম দেবী
পূজিব তাহার পদযুগ।
তিনি সকলের সার যতো ব্যাধি আদি তার
নিন্দি অধম পায় দুখ।।
বিচার করিএ দেখি কোরাণ পুরাণ একি
সারদা বসতি সর্বঘটে।
হিঁদুকি মোচলমানে পয়দা একই স্থানে
আচারেতে জুদাজুদা বটে।।"[৭]

রায়মঙ্গল কাব্যে হিন্দুর ঠাকুর দক্ষিণরায় ও মুসলমান পীর গাজী সাহেবের মধ্যে তুমুল লড়াই হয়েছিল কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি কারোর গায়ে লাগেনি, কারণ যে দেবতা গাজী ও দক্ষিণরায়ের যুদ্ধ থামাতে এসেছিলেন তার অঙ্গে যুগোপৎ হিন্দু মুসলামানের ছাপ ছিল-

"অর্দ্ধেক মাথায় কালা একভাগে চূড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি হাথে।
ধবল অর্দ্ধেক কায় অর্দ্ধনীল মেঘ প্রায়
কোরাণ পুরাণ দুই হাথে।"[৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 71 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঈশ্বর গাজীকে সম্মোধন করে বলেছেন-

"যেই তুমি সেই রায় বর্ব্বর লোকেতে তায়
ভেদ করে দুঃখ পায় নানা।
একমাত্র সবে সার যত কিছু দেখ আর
সকল মিথ্যাকার খেলা।।"[৯]

এই বর্ণনার মাধ্যমে কবি কৃষ্ণরাম দাসের সমাজ সচেতনতার পরিচয় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সপ্তদশ শতকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল, দীর্ঘদিন এই দুই জাতি পাশাপাশি বাস করার ফলে প্রতিবেশী শ্রেণিভুক্ত হয়ে পড়েছিল। সামাজিক জীবনে সুস্থতা সৃষ্টির জন্য এই দুই শ্রেণির মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রয়োজন ছিল যা তৎকালীন সময়ে রচিত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন - ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্ম ঠাকুর ফকিরের বেশ ধারণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে মুসলমানের কাছে যা সত্যপীর, হিন্দুদের কাছে তা সত্যনারায়ণে রূপান্তরিত হয়েছিল। দৈবীভাবের এই পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনই আসলে হিন্দু-মুসলিম ধর্মের সাম্প্রদায়িক সমন্বয় ঘটাতে সহায়তা করেছে।

বাস্তবতা কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যের একটি বড়ো গুণ। কবি তাঁর মঙ্গলকাব্যগুলির পরতে পরতে সুন্দর বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে প্রবাদ-প্রবচনের ছড়াছড়ি, যা বাস্তব অভিজ্ঞতারই প্রমাণ দেয়। কবি কৃষ্ণরাম দাস রচনার বিভিন্ন অংশে সামান্য দু-একটি পঙক্তি ব্যবহার করে সমকালীন সমাজ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবির সঙ্গে ওই জাতির প্রবৃত্তিকে তুলে ধরেছেন। যথা-

"লুব্ধ ব্রাহ্মণ জাতি সহজী ব্রাহ্মণী।
ধনলোভে ধীরে ধীরে চলিল তখনি।।"[১০]

কালিকামঙ্গল কাব্যে ব্রাহ্মণী লোভী স্বভাবের সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। তৎকালীন সময় দেখা যেত ব্রাহ্মণ জাতির প্রকৃতি ছিল খুব লুব্ধ স্বভাবের। তৎকালীন সময় যেহেতু পূজা অর্চনা ছিল ব্রাহ্মণ জাতির মূল বৃত্তি, সেহেতু তাদের ব্রাহ্মণ্য তেজ ব্যবহার করে চাওয়ার প্রবণতা প্রকাশ পেত বেশি মাত্রায়। একইভাবে কবি কালিকামঙ্গল কাব্যে সুন্দরের গোপনে বিদ্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে এক ধরণের চৌর্য বৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন, যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় তৎকালীন সময় রাজদরবারে রাজকুমারদের সাম্রাজ্য রক্ষা এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি সু-শাসক হওয়ার জন্য সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, গণিতশাস্ত্র, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, রণনীতি, রাজনীতি, কলাবিদ্যা, চৌর্যবিদ্যা, কূটনীতি, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত। তবে কখনো কখনো রাজকুমারেরা চৌর্যবিদ্যা শিক্ষা পদ্ধতিটি রাজকন্যার মন প্রেমসমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়ে তাকে সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করার জন্য ব্যবহার করতেন। কালিকামঙ্গল কাব্যে কবি কৃষ্ণরাম দাস সুন্দরের এই প্রবৃত্তি বর্ণনার মাধ্যমে তৎকালীন সময়ের সমকালীন সমাজের রাজপরিবারের বীর সাহসী রাজকুমারদের প্রকৃতির ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুন্দর বিমলা মালিনীর গৃহে আশ্রয় নিয়ে মালিনীর সহায়তায় চিকন মালা গেঁথে বিদ্যার নিকটে পৌঁছে দিয়েছিল-

"চিকন গাঁথনি ফুল দেখি চিত্ত ব্যাকুল
রতিপতি হানিল তখনি।।
মালাটি[১] লইয়া হাতে[২] সুন্দর লিখন তাতে
যত্ন করি পরিল সকল।
বিরহে হরিল জ্ঞান ঘুচিল পূজার ধ্যান
সখিগণে শুনি কুতূহল।।"[১১]

এইরূপে সুন্দর প্রথমে বিদ্যার মন চুরি করে বিচিত্র মালার গাঁথুনি ও লেখনীর মাধ্যমে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 71 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যে কবি কৃষ্ণরাম দাস সায়বেনে পত্নীর ছোট পুত্রবধূর মা-ষষ্ঠীর প্রসাদ চুরি করে খাওয়ার চিত্র অঙ্কন করেছেন-

"কুবুদ্ধি তাহার এই আগে আগে দ্রব্য লই
উদর ভরিল চুরি করি।।
শাশুড়ি আসিএ তার নাহি দেখে উপহার
মনেতে হইল বড় রোষ।
সেই দূরাচার নারী বাঁচে প্রবঞ্চনা করি
দিএ কালবিড়ালের দোষ।।"[১২]

ছোট পুত্রবধূ প্রায়ই এমনই চুরি করে খায় আর কালো বিড়ালের দোষ দেয়। আসলে তৎকালীন সময় বাড়ির বধূরা সাধারণত পেট ভরে ভালো খাদ্য খেতে পেত না। তাই ক্ষুধায় কাতর এমন কিছু গৃহবধূ থাকতেন যারা নিজেদের সামলাতে না পেরে চুরি করে খেত, আর বাড়ির গৃহিনী আর অপরাপর গুরুজনদের হাত থেকে বাঁচতে বিড়ালের দোষ দিত, সমাজ বাস্তবতার সেই ইঙ্গিতই কবি তুলে ধরেছেন।

কবি কৃষ্ণরাম দাস সমাজ সচেতন কবি, তাঁর মঙ্গলকাব্যগুলির পরতে পরতে প্রবচন বাক্যের ছড়াছড়ি রয়েছে। কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা কত বেশি গভীর ছিল তা এই প্রবচন বাক্যের প্রয়োগ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা-

১. 'হাতি হাতি ঝগড়া ভাঙ্গে নল খাগড়া'।[১৩]
২. 'কমলে বেড়িয়া থাকে কুমুদ সঞ্চয়'।[১৪]
৩. 'চাঁদ কিনা চেনা যায় তারাগণ সাথে'।।[১৫]
৪. 'গুণী সে গুণীর পূজা ভালো মতে জানে'।[১৬]

এই ধরণের বহু প্রবাদ প্রবচন ব্যবহারের মাধ্যমে সমকালীন সমাজের জনজীবনের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কবির বাস্তব জ্ঞানের ও সচেতনতা বোধের প্রকাশ ঘটে।

কবি কৃষ্ণরাম দাসের বাস্তব অনুরাগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায় - কন্যার শ্বশুরালয় যাত্রা বর্ণনায়, হিন্দুর ঘরে কন্যার শ্বশুরালয় যাত্রার দৃশ্য বড়োই করুণ। বিশেষ করে তৎকালীন সময়ে কন্যার সঙ্গে পিতামাতার সাধারণত আর সাক্ষাৎ হত না। তৎকালীন সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থাই ছিল মূল বাধা। কালিকামঙ্গল কাব্যে বিদ্যার শ্বশুরালয় গমন দৃশ্যে দেখা যায় পিতা বীর সিংহ রায় জামাতাকে নানান বসন-ভূষণ উপহার দিয়ে যাত্রাপথ সুন্দর করে তোলার চেষ্টা করেছেন। যা সমকালীন সমাজের সঙ্গে বর্তমানেও বহু কন্যার পিতা করে থাকেন। মাতা অশ্রুজলে কন্যাকে বিদায় জানিয়েছেন-

"বিদ্যারে করিয়া কোলে ভাসিল নয়ন জলে
অস্থির হইল রাজরানী।
বিদ্যা মোর কোলচাছা দূর দেশে যাবে বাছা
কেমনে রহিব একাকিনী।।"[১৭]

একইভাবে কবি আরও নিপুণভাবে রায়মঙ্গল কাব্যে রাজকন্যা রত্নাবতীর শশুরালয় যাত্রার দৃশ্য বর্ণনা করেছেন-

"রাজার নয়নে জল করে ছলছল।
কাঁদয়ে পূর্ব্বে লোক হইয়া বিকল।।
কন্যারে লইয়া কোলে রাজরাণী কাঁদে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 71 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিকল রাজরাণী বুক নাহি বাঁধে।।"[১৮]

এই রায়মঙ্গল কাব্যে আরও দেখা যায় রাজরানী অবোধ কন্যা রত্নাবতীকে উপদেশ দিয়ে বোঝাচ্ছেন কীভাবে কন্যা শ্বশুরালয়ে সকলের সাথে ব্যবহার করবে-

"কন্যারে বুঝায় রাণী করিয়া যতন।
দুহার নয়ন জলে তিতে দুই জন।।
তুমি বিদগধ আমি বুঝাইব কিবা।
করিও যতনে অতি শাশুড়ীর সেবা।।
দাসদাসীগণ যতো যতনে পালিও।
জনকজননী বলি সবাকে ডাকিও।।
রোষ না করিহ কভু না কহিও বড় কথা।
তবে সে সবার ঠাঞী যশ পাবে তথা।।
দারুন পরের মন তিলে তিলে ফিরে।
আপনি হইলে ভালো ভয় কিবা কারে।।
করিও স্বামীর সেবা সদা একমনে।
পতিবিনে গতি নাই জীবন মরণে।।"[১৯]

কবি কৃষ্ণরাম দাসের এই বর্ণনা একদিকে যেমন সমকালীন সমাজ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছে তেমনই বর্তমান সময়কেও তুলে ধরেছে। একইভাবে সংস্কৃত কবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' কাব্যে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে মহর্ষি কণ্বমুনি যেভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন হুবহু সেই প্রতিচ্ছবি বর্ণিত হয়েছে।

কমলামঙ্গল কাব্যেও কন্যার পতিগৃহে যাত্রার দৃশ্যটি আরও নিপুণ ভাবে কবি বর্ণনা করেছেন-

"কান্দে রাজা বলে মাতা বড় অবিচার ধাতা
কেন সৃষ্টি করিল এমন।
কোন দেশে জনমিয়া কাহার বসতি গিয়া
এজনমে নাহি দরশন।।"[২০]

কবির শ্বশুরালয়ে যাত্রা দৃশ্যের জীবন্ত বর্ণনা বস্তুত সকল বাঙালি ঘরের, বর্তমানেও এই দৃশ্যের পরিবর্তন হয়নি।

কবি কৃষ্ণরাম দাসের মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারা রায়মঙ্গল, কমলামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে শ্বশুরালয় যাত্রাকালে কন্যার অভিমানের মধ্য দিয়েও প্রকাশ ঘটেছে-

"বাপের চরণধূলি লইল মাথায় তুলি
আকুল হইল যত রামা।
নিদারুণ নাই হইবে বারেক তল্লাস নিবে
বিদেশে পাঠাইয়া দিলে আমা।।"[২১]

একইভাবে রায়মঙ্গল কাব্যে রাজকন্যা রত্নাবতী অভিমানে বলেছে -

"দূরে বিভা দিলে মোরে সাগরের পার।
কাঁদিলে এখন তবে কি হইবেক আর।।"[২২]

কন্যাদান করে পিতাই যেন মহাদোষী তাই জামাতাকে সন্তুষ্ট করাই যেন শ্বশুরের মূল কর্ম। এই ছবি তৎকালীন সমাজে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 71 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভীষণভাবে প্রচলিত ছিল। কারণ তৎকালীন সময়ে পণপ্রথার প্রচলন ছিল। বর্তমানেও কন্যার পিতা জামাতাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় থাকে তবে সময়ের সাথে সাথে তুলনামূলক ভাবে অনেক কম।

কন্যার মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন প্রমুখের মানসিক অবস্থা, কন্যার শ্বশুরালয়ের গমন দৃশ্য বর্ণনায় জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে কবি কৃষ্ণরাম দাসের রচনায়। এই দৃশ্যকে উপলক্ষ্য করে কালিকামঙ্গল এবং রায়মঙ্গল কাব্যের কোথাও কোথাও দার্শনিকতার প্রভাব দেখা যায়। কালিকামঙ্গল কাব্যের সুন্দর শ্বশুরকে বলেছেন-

"সারেতে অচলমন কেন তবে অকারণ
খেদ কর দেব বিজ্ঞজনে।
জায়াপুত্র পরিবার যতেক যাহার আর
জেন যেন জলবিম্বগণে।।"[২৩]

একইভাবে কবি রায়মঙ্গলে দাসীর মাধ্যমে রানীকে এই উপদেশ দিয়েছেন-

"অকারণে কাঁদ রাণী শুন দেখি বলি।
মনেতে ভাবিয়া দেখ সংসার সকলি।।
কেবা কার পুত্রকন্যা কেবা মাতাপিতা।
জ্ঞানবান জন তার না থাকে মমতা ।।
তুমি জনমিলে কোথা বসতি কোথায়।
সংসার এমনি দেখ মোহিত মায়ায়।।"[২৪]

এইভাবে দার্শনিক ভাবধারা প্রকাশের মধ্য দিয়ে কবির কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যের আরও কয়েকটি স্থানে দেখা যায় বাস্তবতার স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। শীতলামঙ্গল কাব্যে মদনদাস জগাতি পালায় নদী পারাপারের সময় শুল্ক আদায়ের ছবি পাওয়া যায়। তৎকালীন সময়ে নদী পারাপারের জন্য পারানীর কড়ির সঙ্গে শুল্ক দিতে হত। শুল্ক আদায়ের বাস্তব প্রতিচ্ছবি, শুল্ক আদায়কারীর মর্যাদাবোধ ও যাত্রী সাধারণের ওপর অত্যাচারের বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে। দেশের রাজশক্তি যতই শক্তিশালী হোক, রাজকর্মচারীই যে দেশের অভ্যন্তরে সব সেই ইঙ্গিতই কবি কৃষ্ণরাম দাস শীতলামঙ্গল কাব্যের মদনদাস জগাতি পালায় তুলে ধরেছেন। একইভাবে কালিকামঙ্গল কাব্যে কোটালের নগর ভ্রমণের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সময়ে রাজ্যে রাজকর্মচারীর প্রভাব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ভাষা প্রয়োগে কবি কৃষ্ণরাম দাসের বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্র অনুসারে তিনি লৌকিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। গাজীর ভাষা উর্দু, কোটালের ভাষা হিন্দি, মুসলমান ফকির ও গাজীর মুখের ভাষা তৎকালীন সময় অবাঙলা হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কারণ বর্তমানে আরবী-উর্দু মিশ্রিত বাঙলা ভাষায় গাজী-ফকিররা কথা বলেন। *কমলামঙ্গল* কাব্যে কবি বহুপ্রকার ধানের উল্লেখ করেছেন- কনকচূড়, পারিজাত, লক্ষীভোগ, মুক্তাঝুরি, প্রভৃতি। কবির সমকালীন সময়-সমাজ সম্পর্কিত বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে ধানের বর্ণনার মাধ্যমে। কবি তাঁর গ্রন্থে কায়স্থদের মর্যাদার কথা নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। এইরূপে নানাভাবে নিখুঁত বর্ণনার মাধ্যমে কবির বাস্তব জ্ঞান, কবিত্ব, রচনাশৈলী, দার্শনিক মনোভাব, ধর্ম-সংস্কৃতির ও সমকালীন সমাজ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, শ্রী সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, রায়মঙ্গলকাব্য,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ৭৯-৮০, পৃ. ১৭২
২. তদেব, শ্লোক- ১২১-১২৩, পৃ. ১৭৬
৩. ভট্টাচার্য, শ্রী সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, ষষ্ঠীমঙ্গল,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 71 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শ্লোক- ৩৫, পৃ. ১৫৩
৪. ভট্টাচার্য, শ্রী সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, কালিকামঙ্গল*, কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ২৫, পৃ. ৫
৫. তদেব, শ্লোক- ৩৭-৪০, পৃ. ৬
৬. ভট্টাচার্য, শ্রী সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, রায়মঙ্গল*, কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ৪১৪, পৃ. ২০১
৭. ভট্টাচার্য, শ্রী সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, শীতলামঙ্গল*, কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ১৩৮-১৪০, পৃ. ২৬৩
৮. ভট্টাচার্য, শ্রী সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, রায়মঙ্গল,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ৪১৬, পৃ. ২০১
৯. তদেব, শ্লোক- ৪১৯, পৃ. ২০১
১০. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, কালিকামঙ্গল*, কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ৭৪৯, পৃ. ৭৮
১১. তদেব, শ্লোক- ২৯০-২৯১, পৃ. ৩২
১২. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, ষষ্ঠীমঙ্গল*, কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ৩৬-৩৭, পৃ. ১৫৪
১৩. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, রায়মঙ্গল,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ২৪১, পৃ. ১৮৬
১৪. তদেব, শ্লোক- ৮২১, পৃ. ২৩৫
১৫. তদেব, শ্লোক- ৮২২, পৃ. ২৩৫
১৬. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, কালিকামঙ্গল*, কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ১২৪৬, পৃ. ১৩০
১৭. তদেব, শ্লোক- ১১৮৮, পৃ. ১২৩
১৮. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, রায়মঙ্গল,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ৮৮৪-৮৮৫, পৃ. ২৪০
১৯. তদেব, শ্লোক- ৮৯৪-৮৯৯, পৃ. ২৪০-২৪১
২০. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, কমলামঙ্গল*, কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ৬১৭, পৃ. ৩৪৩
২১. তদেব, শ্লোক- ৬১৬, পৃ. ৩৪৩
২২. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, রায়মঙ্গল,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ৯০৬, পৃ. ২৪১
২৩. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, কালিকামঙ্গল*, কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ১২৬১, পৃ. ১৩১
২৪. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, রায়মঙ্গল,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ৮৯১-৮৯৩, পৃ. ২৪০

Bibliography:

ঘোষ, কবিতা, *সপ্তদশ শতকের বাঙালি সমাজ ও সাহিত্য,* কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশনা, ১৯৯৪
চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার, *লোকউৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৪ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 71 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খন্ড, প্রথম পর্ব, কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ সংস্করণ: ২০০৯-১০

বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ, *পঞ্চপাসনা,* কলকাতা: ফার্মা কে. এল. এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৪,

বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০২০

ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* কলকাতা: এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, অষ্টম সংস্করণ: ১৯৯৮

ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ, *হিন্দুদের দেবদেবীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (দ্বিতীয় পর্ব),* কলকাতা: ফার্মা কে. এল. এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫

ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ, *হিন্দুদের দেবদেবীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (তৃতীয় পর্ব),* কলকাতা: ফার্মা কে. এল. এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০

ভট্টাচার্য, শ্রীসত্যনারায়ণ, *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী,* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮

সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ: ১৯৭৫

শরিফ, আহমেদ, *বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য,* ঢাকা: বর্ণমিছিল, ১৯৭১